ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ১৮৫-২০২
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4113

মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় ইতিহাস: প্রসঙ্গ মহম্মদপুর

ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: The Liberation War of Bangladesh is the most glorious chapter of the history of the Bengali nation. This war was the final result of long twenty-three years of exploitation and extortion by West Pakistan. In the War of Liberation, the whole geographical area of East Pakistan was strategically divided into eleven sectors with a sector commander for each of them. For better efficiency in military operations, each of the sectors were divided into a number of sub-sectors under a commander. Sector commanders and sub-sector commanders were specially supported by the commanders of local forces and their subordinate freedom fighters. After Bangabandhu's historic address on 7 March, some patriotic young people of Muhammadpur in Magura joined the war immediately. Students, peasants, workers and political activists joined the movement with high spirit to liberate Bangladesh from the Pakistan army. Along with *Mukti Bahini*, some local forces such as *Yaqub Bahini, Jamai Bahini, Jalal Bahini* etc. were formed by individual efforts. These local forces stayed in their respective areas from the very beginning of the war to the end and made all efforts against the Pakistani forces and their local allies. They played a significant role in the war of Nohata, Binodpur, Joyrampur, Muhammadpur etc. But the contribution of these local forces has not been placed properly in the history of the liberation war even though they were the vital forces of battles in the field. The present paper is a humble attempt to highlight the contribution of local forces of Muhammadpur in the district of Magura in the Liberation War of Bangladesh.

Key Words: Muhammadpur, Local force, Liberation war, Local war.

ভূমিকা: বাঙালির ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি। এ যুদ্ধে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ জীবন ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে মুক্তিকামী জনতা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এমনি একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান মাগুরা মহকুমার মহম্মদপুর থানা[১]। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে

উদ্দীপ্ত হয়ে মহম্মদপুরের স্বাধীনতাকামী জনগণ অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে ৫ ডিসেম্বর মহম্মদপুর হানাদার মুক্ত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করে। ব্যক্তি প্রচেষ্টায় স্থানীয়ভাবে বীর প্রতীক গোলাম ইয়াকুব এর নেতৃত্বে *ইয়াকুব বাহিনী* ও কাজী নূর মোস্তফা (জামাই) এর নেতৃত্বে *জামাই বাহিনী* এবং বীর উত্তম মো. জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে *জালাল বাহিনী* গড়ে ওঠে। সেক্টর কমান্ডার ও সাব-সেক্টর কমান্ডারগণের বিশেষ সহায়তায় এ সকল বাহিনীর কমান্ডার ও সদস্যবৃন্দ মুক্তিকামী জনতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নহাটা, বিনোদপুর, জয়রামপুর, মহম্মদপুর প্রভৃতি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধকালীন মহম্মদপুর থানায় সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে মাঠ পর্যায়ের অনেক ঘটনা ও তথ্য এখনো অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে। যেমন মাঠপর্যায়ে রণাঙ্গণে বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়ক, সহ-অধিনায়ক ও মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ ভূমিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক সংখ্যা, বধ্যভূমি সনাক্তকরণ ও গণহত্যায় নিহত শহিদদের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় আজও নির্মোহভাবে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে এ সব তথ্য উন্মোচিত হলে মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হবে। তাই স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজের ভিত্তিতে ইতিহাস রচিত হলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যসমৃদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ভূ-অবস্থানগত কারণে মহম্মদপুর মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এটি ফরিদপুর ও বৃহত্তর যশোর (মাগুরা ও নড়াইল) জেলার সংযোগ স্থলে অবস্থিত।[২] মধুমতি ও নবগঙ্গা নদী কেন্দ্রিক নৌ-পথ ও স্থল পথে উভয় জেলার সঙ্গে যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সমর কৌশলগত কারণে মহম্মদপুর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর এলাকা ভিত্তিক প্রতিরোধ, রণাঙ্গণের চিত্র, গণহত্যা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের নৃশংসতা প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ, মুক্তিযুদ্ধ কোষ, সেক্টর ভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থ, জেলা ভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থসহ বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। বৃহত্তর যশোরের ওপর লিখিত আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধে যশোর* (১৯৯৪); আকবর হোসেন, (মাগুরা আকবর বাহিনীর কমান্ডার) মুক্তিযুদ্ধে *আমি ও আমার বাহিনী* (১৯৯৬); গালিব হরমুজ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, যশোর খণ্ড (২০০১); তারাপদ দাশ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর* (২০০৪);

মোঃ আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (২০১০); জাহিদ রহমান (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধে আকবর বাহিনী: শত যোদ্ধার স্মৃতিকথা*, প্রথম খণ্ড (২০১৩); মঞ্জুরুল ইসলাম, *শৈশবে দেখা মুক্তিযুদ্ধের গল্প* (২০১৬); পরেশ কান্তি সাহা, *মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা* (২০১৭); বীরেন মুখার্জী, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস* : মাগুরা জেলা (২০১৭); হারুন-অর-রশিদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, ১ম - ১০ম খণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে

মাগুরা মহকুমার মুক্তিযুদ্ধের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এগুলোকে মহম্মদপুরের মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। অধিকাংশ গ্রন্থ বিবরণমূলক ও অপূর্ণাঙ্গ। কোনো কোনো গ্রন্থ ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে তথ্যের বিভ্রাট রয়েছে। *মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ* রচনায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হলেও সংক্ষিপ্তকরণের জন্য অনেক তথ্য বাদ দেয়া হয়েছে। *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থটি একটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভের পরিমার্জিত রূপ হলেও উক্ত গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধকালীন মহম্মদপুরের তথ্য উপাত্ত খুবই অপ্রতুল। *মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা* গ্রন্থটি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক গ্রন্থ। এটি গবেষণামূলক গ্রন্থ নয় এখানে তথ্যের বিভ্রাট পরিলক্ষিত হয়। ফলে মহম্মদপুর থানার মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল ইতিহাস প্রণয়নের জন্য এ গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytical Method) ও জরিপ পদ্ধতি (Survey Method) অনুসরণ করা হয়েছে। মহম্মদপুর থানার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রকাশনা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে তা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য প্রদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, চিন্তার বৈপরীত্য, মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি বিভ্রাট ও তাঁদের মৃত্যুবরণ ইত্যাদি গবেষণার সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মহম্মদপুর পরিচিতি

বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মধুমতি নবগঙ্গা বিধৌত মাগুরা জেলার ঐতিহ্যবাহী এলাকা হলো মহম্মদপুর। এর উত্তর-পূর্বকোণে ফরিদপুর জেলার মধুখালি উপজেলা ও উত্তর-পশ্চিমকোণে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলা। পূর্বে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলা এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলা। পশ্চিমে মাগুরা সদর উপজেলা, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলা এবং দক্ষিণে নড়াইল জেলার সদর উপজেলা অবস্থিত।[৩] মহম্মদপুরের পূর্বকোণ দিয়ে প্রবল খরস্রোতা নদী মধুমতি প্রবাহিত এবং পশ্চিম কোণ দিয়ে প্রবাহিত নবগঙ্গা নদী। মুক্তিযুদ্ধকালে উভয় নদীপথ যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মহম্মদপুর যশোরের অন্যতম খ্যাতনামা শহর হিসেবে পরিচিত ছিল। পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল 'বাগজান'। রাজা সীতারাম রায় (১৬৫৮-১৭১৪) ভূষণা থেকে তার রাজধানী এখানে স্থানান্তর করেন এবং একজন সাধক পুরুষ মাহমুদ (র.) এর নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করেন মাহমুদপুর। এই মাহমুদপুরই কালক্রমে মহম্মদপুর রূপ লাভ করে।[৪]

চিত্র ১: মহম্মদপুর উপজেলা

উৎস: Bangladesh–map-all.blogspot.com, 23 November, 2017.

১৯২৪ সালে প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে মহম্মদপুর থানা স্থাপিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়।[৫] উপজেলায় ৮টি ইউনিয়ন ও ১৮২টি গ্রাম রয়েছে। মোট আয়তন ২৩৪.২৯ বর্গকিলোমিটার। ১৯৭১ সালে মহম্মদপুর থানা মাগুরা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল আর মাগুরা বৃহত্তর যশোর জেলাধীন ছিল।

মহম্মদপুরে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু যশোর জেলা সফরে এলে মুক্তিকামী জনতা প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগসহ অন্যান্য

স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ পরবর্তী পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরে ব্যাপক গণসংযোগ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর মাগুরা মহকুমার রাজনীতিবিদ ও মুক্তিকামী জনতা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ৮ মার্চ মাগুরায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।[৬] আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন এম.এন.এ ও সৈয়দ আতর আলী এম.পি. এ সংগ্রাম কমিটির উপদেষ্টা এবং এ্যাডভোকেট মো. আছাদুজ্জামান এম.পি এ কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। একই সময়ে মহম্মদপুর থানা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- মোঃ রোস্তম আলী শিকদার, আব্দুর রশিদ বিশ্বাস, গোলাম ইয়াকুব, মোঃ গোলাম রব্বানী, মোঃ নজরুল ইসলাম ওরফে নজির মিয়া, মোঃ কাইয়ুম মিয়া, মোঃ লুৎফর রহমান, মোঃ আইয়্যুব মিয়া, মোঃ তফসির উদ্দিন, মোঃ আতিয়ার রহমান, খোন্দকার রওদাক আলী প্রমূখ।[৭] থানা কমিটি মহকুমা সংগ্রাম কমিটির নির্দেশক্রমে কার্যক্রম পরিচালনা করত। সংগ্রাম কমিটির ন্যায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে *স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি (স্যাক)* গঠিত হয়।[৮] মাগুরায় ছাত্রলীগ সভাপতি রেজাউল হকের নেতৃত্বে এ কমিটিতে মহম্মদপুরের রোস্তম আলী, আলতাফ হোসেন প্রমূখ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৯] ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পর থানা সংগ্রাম কমিটি মুক্তিযুদ্ধের জন্য অবসরপ্রাপ্ত আনসার, পুলিশ ও সেনাসদস্য এবং স্থানীয় মুক্তিকামী জনতার সহায়তায় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে। ২৭ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১০] গোলাম ইয়াকুব মহম্মদপুর থানায় হামলা চালিয়ে ১৮টি রাইফেল ও ১টি রিভলবার ছিনিয়ে নেন।[১১] তিনি শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে *ইয়াকুব বাহিনী* নামে একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলেন। অপরদিকে কাজী নূর মোস্তফা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন, যা পরবর্তীকালে *জামাই বাহিনী* নামে পরিচিতি লাভ করে।[১২] মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মোঃ আব্দুর রশীদ বিশ্বাস বিনোদপুরে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এভাবে বিনোদপুর[১৩], মহম্মদপুর ও নহাটা[১৪]সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত (২৩ এপ্রিল) সংগ্রাম কমিটি থানার বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে যুদ্ধবিষয়ক গান পরিবেশন, কবিতা ও নাটক উপস্থাপন এবং নিয়মিত সভা সমাবেশ ও মিছিল করে মুক্তিকামী জনতাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।[১৫]

মহম্মদপুরে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ

পাকিস্তানি বাহিনী বিনোদপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ও মহম্মদপুর টিটিডিসি হলে (উপজেলা পরিষদ ভবন) অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতাকামী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদপুরের প্রবেশদ্বার মাগুরা-মহম্মদপুর ও নড়াইল-মহম্মদপুর এলাকার সড়ক ও নৌ-পথে (নবগঙ্গা ও মধুমতি নদী) শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

তারা এ অঞ্চলে মেজর রিয়াজ ও ক্যাপ্টেন আজমলের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনীকে শক্ত হাতে দমন করতে সক্ষম হন।[১৬] নহাটা ছিল মহম্মদপুর থানার মুক্তিযুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র। গোলাম ইয়াকুব ও কাজী নূর মোস্তফার অবস্থান নহাটায় হওয়ায় সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী কোনো ক্যাম্প স্থাপন করতে পারেনি। তারা মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ৪ বার নহাটা আক্রমণ করে।[১৭] এ সময়ে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নারী নির্যাতনের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং থানা শত্রুমুক্ত করতে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নহাটা, বিনোদপুর, জয়রামপুর[১৮] ও মহম্মদপুর নামক চারটি ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়।

চিত্র ২: নহাটা যুদ্ধক্ষেত্র (২১ আগস্ট, ১৯৭১)

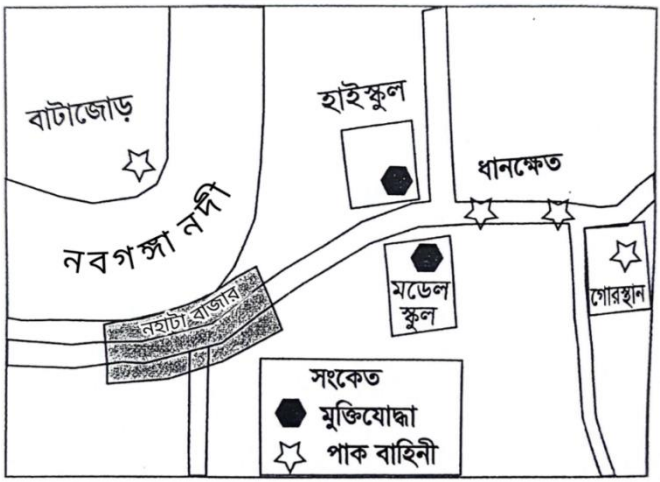

উৎস: মঞ্জুরুল ইসলাম, *শৈশবে দেখা মুক্তিযুদ্ধের গল্প(ঢাকা.কাকলী প্রকাশনী,২০১৬) ৪৮*।
মানচিত্রটি প্রবন্ধকার কর্তৃক সম্পাদিত।

নহাটা যুদ্ধঃ মে মাসের শেষ দিকে হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা মহম্মদপুরের অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন নহাটা বা নহাটা গ্রাম আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিআক্রমণে ৪ জন রাজাকার নিহত হয়। হানাদার বাহিনী নবগঙ্গা নদী পার হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ সময়ে তাদের গুলিতে পাচু মাঝি নদীতে নৌকার ওপর গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন।[১৯] তিনিই মুক্তিযুদ্ধে নহাটার প্রথম শহিদ। ২১ আগস্ট পাকিস্তানি বাহিনীর এক কোম্পানি সৈন্য ও রাজাকাররা সম্মিলিতভাবে নহাটা আক্রমণ করে। তারা বাজারে অগ্নিসংযোগ করে দোকান-পাট পুড়িয়ে দেয়। হানাদার বাহিনী নহাটা গোরস্থান এবং মুক্তিযোদ্ধারা নহাটা মডেল স্কুল (প্রাইমারি স্কুল)

মাঠে অবস্থান গ্রহণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর মোশারফ হোসেন এবং একজন ক্যাপ্টেনসহ ৫৬ জন সৈন্য নিহত হয়। জামাই বাহিনীর কমান্ডার কাজী নূর মোস্তফা মেজর মোশারফের নেমপ্লেট ও সোল্ডার ব্যাজ খুলে নেন, যা পরবর্তীতে বয়রা কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদাকে উপহার দেন।[২০] মডেল স্কুলের দক্ষিণ-পার্শ্বে নহাটার গোলাম রব্বানীর অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী মহিরন নেছা গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। এ সময়ে হানাদার বাহিনীর গুলিতে মুক্তিযোদ্ধা পুলিশ সদস্য মুন্সি নূরুল হক শহিদ হন।[২১] সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলা প্রচণ্ড যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গোলাম ইয়াকুব ও কাজী নূর মোস্তফা।

চিত্র ৩: বিনোদপুর যুদ্ধক্ষেত্র (৪ অক্টোবর, ১৯৭১)

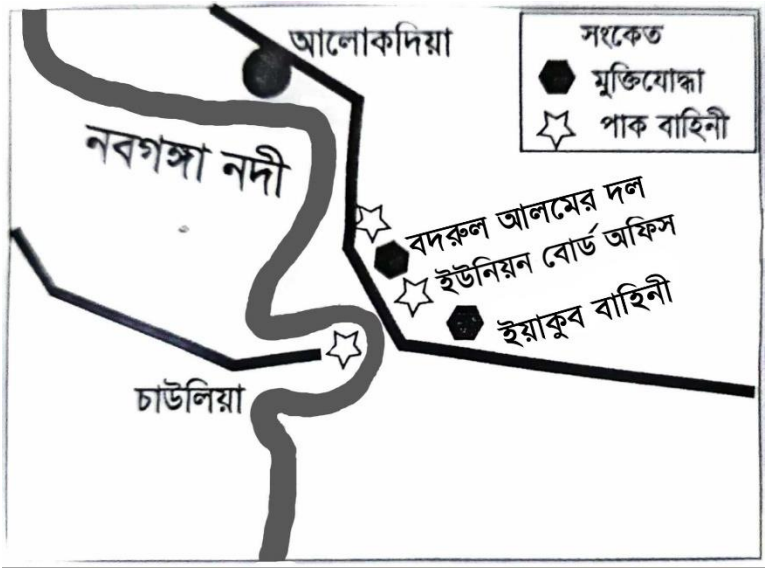

উৎস: মঞ্জুরুল ইসলাম, *শৈশবে দেখা মুক্তিযুদ্ধের গল্প*, ৭১। মানচিত্রটি প্রবন্ধকার কর্তৃক সম্পাদিত।

বিনোদপুর যুদ্ধ: নহাটার ইয়াকুব বাহিনী ও শ্রীপুরের (মাগুরার একটি থানা) আকবর বাহিনী মহম্মদপুর উপজেলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত বিনোদপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের অস্থায়ী রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ক্যাম্পের উত্তর দিকে কমান্ডার বদরুল আলমের নেতৃত্বে ৬৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেন। পূর্বদিকে ইয়াকুব বাহিনীর একটি অংশ মহম্মদপুরমুখী রাস্তায় মোতায়েন করা হয়। গোলাম ইয়াকুব নিজে মূল বাহিনী নিয়ে ক্যাম্পের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থান নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে রাজাকাররাও তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ৪ অক্টোবর প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। এক পর্যায়ে রাজাকাররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলে

মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর গুলি করতে থাকেন। পার্শ্ববর্তী বাংকারগুলো ধ্বংস হলে তারা আত্মসমর্পণের জন্য চিৎকার শুরু করে। আক্রমণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১৭ বছরের কলেজ ছাত্র কিশোর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল আলম মুকুল শহীদ হন।[২২] রাজাকারদের আত্মসর্মপণের আকুতির প্রাক্কালে পার্শ্ববর্তী আলোকদিয়া বাজার হতে ৫০-৬০ জন রাজাকার পেছন দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ করে। একই সময়ে মাগুরা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি দল বিনোদপুরের পশ্চিম পার্শ্বের চাউলিয়া গ্রামে এসে পৌঁছে এবং মর্টার ও এল এমজি দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এমতাবস্থায়, কমান্ডার বদরুল আলম সবাইকে শত্রুদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। এরূপ ত্রিমূখী আক্রমণের মুখেও মুক্তিযোদ্ধারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কৌশল অবলম্বন করে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ যুদ্ধে ৬ জন রাজাকার নিহত হয়। মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার মোস্তফা ও গোলেবর রহমান শত্রুর গুলিতে আহত হন।[২৩]

চিত্র ৪: জয়রামপুর যুদ্ধক্ষেত্র (১৬ অক্টোবর, ১৯৭১)

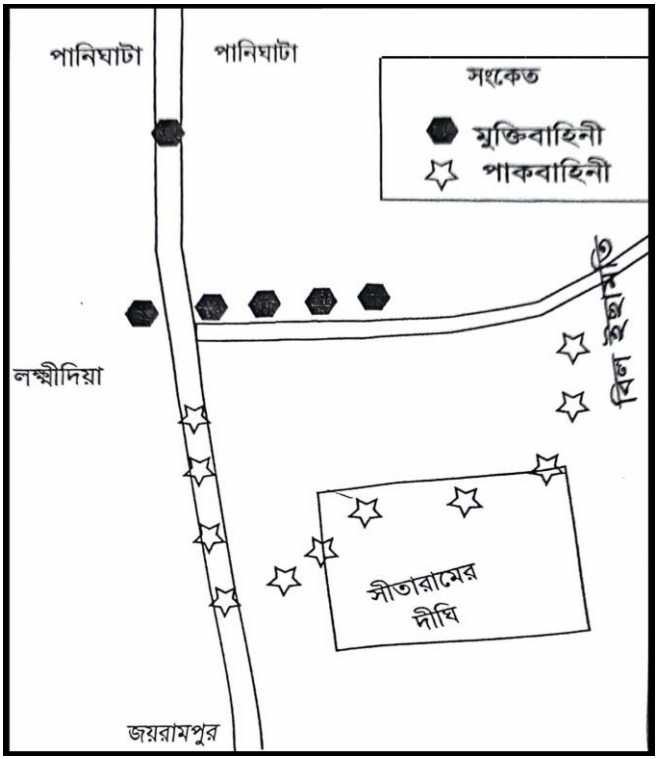

উৎস: মঞ্জুরুল ইসলাম, *শৈশবে দেখা মুক্তিযুদ্ধের গল্প*, ৭৯। মানচিত্রটি প্রবন্ধকার কর্তৃক সম্পাদিত।

জয়রামপুর যুদ্ধ: উপজেলা সদর থেকে ১৫-১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে নহাটা ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। নড়াইল ও মাগুরা থেকে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য নবগঙ্গা নদী দিয়ে কার্গোযোগে জয়রামপুর পৌঁছায়। পাকিস্তানি বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা লক্ষীদিয়া মসজিদের কাছে বড় রাস্তার ঢালে অবস্থান নেন। রাজাকারদের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে পাকিস্তানি বাহিনী দ্রুততার সাথে বড় রাস্তা থেকে শুরু করে রাজা সীতারাম রায়ের দীঘির দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত অবস্থান নেয়। শুরু হয় জয়রামপুরের বিখ্যাত সম্মুখ যুদ্ধ। দুপুর থেকে রাত অবধি যুদ্ধ চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে গোলাম ইয়াকুব যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। কাজী নূর মোস্তফা, নজির নায়েব, আব্দুর রশিদ, আতিয়ার, আবু সাঈদ, রফিক প্রমূখ মুক্তিযোদ্ধা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[২৪] উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়ের পাশাপাশি এক পর্যায়ে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তানি বাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে আর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের গুলি করতে থাকেন। তাদের প্রতিরোধ করতে কমান্ডার গোলাম ইয়াকুব এল এমজি দিয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ উভয় দিকেই শত্রুদের উপর অবিরাম ব্রাশ ফায়ার করতে থাকেন। তিনি এ যুদ্ধে প্রায় তিন শতাধিক রাউন্ড গুলি ছোড়েন। যুদ্ধে অর্ধশতাধিক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। কিশোর যোদ্ধা আবির হোসেন হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মধ্যরাতে শাহাদাত বরণ করেন।[২৫]

চিত্র ৫: মহম্মদপুর যুদ্ধক্ষেত্র (১৯ নভেম্বর, ১৯৭১)

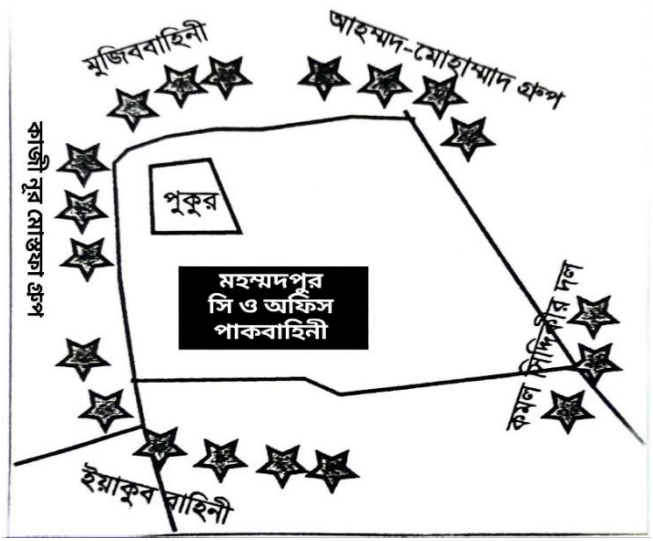

উৎস: *মঞ্জুরুল ইসলাম, শৈশবে দেখা মুক্তিযুদ্ধের গল্প*, ৩৬। মানচিত্রটি প্রবন্ধকার কর্তৃক সম্পাদিত।

মহম্মদপুর যুদ্ধঃ মহম্মদপুর সদরে (উপজেলা পরিষদ) হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা টিটিডিসি ভবনে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে বিভিন্ন গ্রামে লুটপাট ও নিরীহ মানুষদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮ নভেম্বর রাতের প্রথম দিকে ক্যাম্প-ইন-চার্জ মেজর হায়াত বেগ সকল সৈন্য ও রাজাকারদের একত্রিত করে এক সংক্ষিপ্ত উদ্দীপনাময় ভাষণ প্রদান করে। (ভাষণের বঙ্গানুবাদ) "আমাদের চির শত্রু হিন্দুস্থানের মদদে হাজার হাজার মুক্তি দেশের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওদের সাথে সিভিল ড্রেসে ইন্ডিয়ান আর্মির সৈন্যরাও আছে। ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ হতে পারে। ভয়ের কিছু নেই। আমরা হলাম পৃথিবীর সেরা সৈন্যবাহিনীর সদস্য। দশদিন যুদ্ধ চালানোর মত রসদ জমা আছে। দরকার হলে আমরা এয়ার সাপোর্ট পাবো। ওকে, গুড নাইট।"[২৬]

অপরদিকে একই রাতে উপজেলা সদর থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে ঝামা বাজারে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণ ও নড়াইল অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমল সিদ্দিকীসহ সকলেই ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। ইয়াকুব বাহিনী ক্যাম্পের দক্ষিণ ও পশ্চিমে, কাজী নূর মোস্তফা ও আবুল খায়েরের বাহিনী উত্তরে, উত্তর পূর্ব কোণে আহম্মদ-মোহাম্মদের দল। ২ ইঞ্চি মর্টারসহ কমল সিদ্দিকীর দল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থান গ্রহণ করেন। এভাবে তারা ক্যাম্পের চারদিক ঘিরে ফেলেন। ভোর রাতে ক্যাম্পে চতুর্মূখী আক্রমণ শুরু করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে গুলি বিনিময় হয়। এ যুদ্ধে আহম্মদ হোসেন ও মোহাম্মাদ হোসেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা ভবনের ছাদের বাংকারে স্থাপিত মেশিনগান দিয়ে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ করে। ইয়াকুব বাহিনী গুলি ছুড়তে ছুড়তে ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছালেও শক্তিশালী মেশিনগানের কারণে সামনে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কমল সিদ্দিকী মেশিনগানে আঘাত হানার জন্য মর্টার হামলা চালান। কিন্তু গোলা-লক্ষ ভ্রষ্ট হয়। এরূপ কঠিন মূহুর্তে মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ হোসেন ও মোহাম্মাদ হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং সহোদর দুই ভাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শাহাদাত বরণ করেন। এ যুদ্ধে রফিউদ্দিন ও ইপিআর সদস্য মুহাম্মদ আলী নামে আরো দু'জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।[২৭] যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজাকারসহ বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী গুলি বর্ষণের জন্য হেলিকপ্টার পর্যন্ত ব্যবহার করে। নহাটা, জয়রামপুর ও মহম্মদপুর এ ৩টি যুদ্ধের সংবাদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী, কোলকাতা, অল ইন্ডিয়া রেডিও, রেডিও পাকিস্তান ও বিবিসি লণ্ডন থেকে প্রচারিত হয়।

পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহাযোগীদের লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন ও গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনী ২৩ এপ্রিল মাগুরা শহরে অনুপ্রবেশের পর তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহম্মদপুরে রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। মে মাসের শুরুতে উপজেলায় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর আবুল হোসেন সিন্দাইনের নেতৃত্বে আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। হানাদার বাহিনী বিনোদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ধ্বংসের চেষ্টা করলে মুক্তিযোদ্ধারা তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। পাকিস্তানি বাহিনী প্রচুর গুলিবর্ষণ করে এবং গণহত্যা চালায়। বিনোদপুর গণহত্যায় উচ্চশিক্ষিত যুবক আবদুর রাজ্জাক শহীদ হন।[২৮]

এ সময়ে তারা অত্র এলাকার বিভিন্ন বাড়িঘরে লুটপাট চালায়। ২৬ জুলাই হানাদার বাহিনী নহাটা অঞ্চল আক্রমণ করে নহাটা বাজার ও পার্শ্ববর্তী নারান্দিয়া গ্রামে প্রায় ২০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। তারা অরুণ বোসকে ধরে কানের ভিতর রাইফেলের নল ঢুকিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এ সময়ে তারা নহাটা সংলগ্ন নারান্দিয়া ও বেজড়া গ্রামে গণহত্যা চালিয়ে ৫ জনকে শহিদ করে।[২৯]

বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র নহাটা বাজারে হানাদার বাহিনী ৪ বার অগ্নিসংযোগ করে মালপত্রসহ দোকান-পাট সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। উপজেলা পরিষদ ভবন ও বিনোদপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ছিল তাদের নির্যাতন কেন্দ্র ও বন্দিশিবির। এখানে হানাদার বাহিনী রাজাকার চাঁদ আলী শিকদার, আবুল হোসেন সিন্দাইন ও আব্দুর রশিদের সহায়তায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধরে এনে নির্যাতন করতো। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, স্বাধীনতা বিরোধী এই স্থানীয় রাজাকার, আল্‌বদর ও শান্তি কমিটির সদস্যরা ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। কারণ তাদের তথ্য ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই পাকিস্তানি বাহিনী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো। তারা নিরীহ মানুষকে হত্যা, বিভিন্ন হাট-বাজার, গবাদি পশু, বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে তথ্য-প্রদান, নারীদেরকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়াসহ বিভিন্ন অপকর্মে সহযোগিতা করতো।[৩০] পাকিস্তানি সেনাদের বিভিন্ন অপরাধের সূত্র অনুসন্ধানে 'যুদ্ধাপরাধীর গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ' এবং 'War Crimes Facts Finding Committee' (WCFFC) গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকাশিত এম.এ. হাসানের *পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন* গ্রন্থে সাক্ষী হিসেবে মাগুরার মুক্তিযোদ্ধা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা একাত্তরে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের বর্বর নির্যাতনের কথা তুলে ধরেছেন।[৩১]

বধ্যভূমি

নবগঙ্গা নদী তীরবর্তী বিনোদপুর বাজার-ঘাট ছিল হানাদার বাহিনীর বধ্যভূমি। তারা থানার বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষদের ধরে এনে বিনোদপুর ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের রাজাকার ক্যাম্পে নির্যাতন করতো। অতঃপর বাজার ঘাটে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে মৃতদেহ নবগঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করতো। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এখানে প্রায় ৩০টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ১৩ জনের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩২] দূর-দূরান্তের অনেক মানুষ শহীদ হওয়ায় তাদের পরিচয় এখনো অজানা রয়েছে।

মহম্মদপুর মুক্তিযুদ্ধে পেশাজীবী শ্রেণির ভূমিকা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত জনযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি ও যুদ্ধকালে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ সর্বাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে মহম্মদপুর থানা হানাদার মুক্ত করে। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অবদান তুলে ধরা হলো:

আকবর হোসেন মিয়া (১৯২৭-২০১৫)

আকবর হোসেন মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার খামারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালের মার্চে ভাষা আন্দোলন '৬৬ সালের ছয় দফা ও '৭০ সালের নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। তিনি বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য (জিসিআই ইনস্ট্রাক্টর) ছিলেন। তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আকবর হোসেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একটি বাহিনী গড়ে তোলেন; যা *আকবর বাহিনী* নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বাহিনীতে ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১২৮ জন এবং সাধারণ পরিবারভুক্ত প্রায় ১০০০ যোদ্ধা ছিল। *আকবর বাহিনী* বিনোদপুর যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বাহিনীর বীরত্বের সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচারিত হতো।[৩৩] আকবর হোসেনের লিখিত গ্রন্থ *মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী।*

গোলাম ইয়াকুব (১৯১৯-২০০১)

গোলাম ইয়াকুবের জন্ম মহম্মদপুর থানার নারান্দিয়া গ্রামে। তিনি প্রাক্তন আনসার কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭৮-'৭৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের গঠনতন্ত্র রচনাকারীদের মধ্যে তিনি একজন সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন যা *ইয়াকুব বাহিনী* নামে

পরিচিত। তাঁর বাহিনীতে নিয়মিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫০ জনের অধিক। গোলাম ইয়াকুব ও তাঁর বাহিনী মহম্মদপুর, বিনোদপুর, নহাটা, জয়রামপুর, প্রভৃতি যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।[৩৪] তিনি মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রাপ্ত হন।

কাজী নূর মোস্তফা (১৯৪০-২০১৭)

মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার কমলাপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কুষ্টিয়ায় পুলিশের এস.আই পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়া যুদ্ধে একজন পাকিস্তান সৈন্যকে হত্যা করে তার নিকট থেকে চাইনিজ এস এমজি ও গুলি নিয়ে পরিবারসহ মহম্মদপুর থানার নহাটার ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী ঝগড়দিয়া গ্রামে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। এ কারণে তাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনী অত্র অঞ্চলে *জামাই বাহিনী* নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর দলের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন পুলিশ, ইপিআর ও মুজাহিদ। আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা অনুযায়ী তাঁর বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৯০ এর অধিক। যুদ্ধকালে তিনি ও তাঁর বাহিনীর সাংকেতিক নাম ছিল *লাউডোগা*। কাজী নূর মোস্তফা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নহাটা, মহম্মদপুর ও জয়রামপুর প্রভৃতি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩৫]

মাসরুরুল হক সিদ্দিকী (জন্ম: ১৯৪১)

নড়াইল মহকুমার সদর থানার হবখালী গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি কমল সিদ্দিকী নামে পরিচিত। তৎকালীন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিচিত মুখ কমল সিদ্দিকী ৭১ পূর্ব সকল আন্দোলন-সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। মহম্মদপুরের যুদ্ধে তিনি ও তাঁর বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তা ছাড়া মহম্মদপুর থানা নড়াইল মহকুমা সংলগ্ন হওয়ার কারণে মহম্মদপুরে শত্রু বাহিনীর তৎপরতা ও কার্যক্রমের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন।[৩৬]

মোঃ বদরুল আলম (জন্ম: ১৯৪২)

মাগুরা সদর থানার বেল নগরে তাঁর জন্ম। যুদ্ধকালে তিনি সেনাবাহিনীতে সার্জেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি আকবর বাহিনীতে যোগ দেন। এই বাহিনীকে ৪টি কোম্পানিতে বিভক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন একটি কোম্পানির কমান্ডার। বিনোদপুর যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর রণকৌশল ও সাহসিকতা ছিল প্রশংসনীয়।[৩৭]

মো. আব্দুর রশীদ বিশ্বাস (১৯১৯-১৯৯১)

মহম্মদপুর থানার খালিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, আঞ্চলিক কমান্ডার ও মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি (১৯৭২-৭৭) ছিলেন। *All India Student Fedaration (AISF)* এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে '৭১ পর্যন্ত সকল আন্দোলন সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি নহাটা, মহম্মদপুর, জয়রামপুর, বহলবাড়িয়া[৩৮] প্রভৃতি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বাউল শিল্পী আব্দুল লতিফ (জন্ম: ১৯৪০)

মাগুরা মহকুমার সদর থানার জগদল ইউনিয়নের খর্দ্দছনপুর গ্রামে আব্দুল লতিফের জন্ম। তিনি ৮নং সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুরের অধীনে যুদ্ধ করেন। জারিগান ও ধুয়া গানে পারদর্শী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে জারিগানের আসরে সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে রাখতেন।[৩৯] মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিকামী জনতাকে সংঘবদ্ধ করতে এবং শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাতে তিনি অবদান রাখেন।

মহম্মদপুর থানার বিভিন্ন যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয়

মহম্মদপুর থানায় সংঘটিত বিভিন্ন সম্মুখযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা হলেন: পুলিশ সদস্য মুন্সী নূরুল হক, পিতা- মুন্সী গোলাম হোসেন, নহাটা, মোসাম্মৎ মহিরন নেছা, স্বামী- গোলাম রব্বানী, নহাটা, মো. পাচু বিশ্বাস, পিতা- কেয়াম উদ্দিন বিশ্বাস, ঝগড়দিয়া, অরুণ বোস, রামদেরগাতি, বেরইল (নহাটা যুদ্ধে শহীদ); কিশোর মো. জহুরুল হক মুকুল, পিতা- শেখ বদরউদ্দিন আহমদ, বয়স-১৭ বছর (বিনোদপুর যুদ্ধে শহীদ); কিশোর আবির হোসেন, পিতা- মোঃ মনসুর মোল্যা, কাশিপুর, বয়স-১৬ বছর, (জয়রামপুর যুদ্ধে শহীদ); স্কুল শিক্ষক হাবিবুর রহমান মোহাম্মাদ ও আহম্মদ হোসেন, পিতা- আফসার উদ্দিন মোল্যা, নাগরিপাড়া (দুই সহোদর), মোঃ রফিউদ্দিন, পিতা- মোঃ আব্দুর রহমান মোল্যা, কাশিপুর, ইপিআর সদস্য মুহাম্মদ আলী, রূপদিয়া, যশোর (মহম্মদপুর যুদ্ধে শহীদ)। উপরিউক্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ও যুদ্ধ চলাকালে শহীদ হয়েছেন। এ ছাড়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আরো অনেকেই গণহত্যার শিকার হয়েছেন।[৪০]

উপসংহার

দীর্ঘ ২৪ বছরব্যাপী পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মহম্মদপুর থানার জনগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারই ধারাবাহিকতায়

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ এলাকার মানুষ সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার ও আলবদর বাহিনীকে পরাজিত করে ৫ ডিসেম্বর মহম্মদপুর থানা হানাদার মুক্ত করে। বীর প্রতীক গোলাম ইয়াকুব ও কাজী নূর মোস্তফা নহাটায় অবস্থান করায় নহাটা যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র নহাটা বাজারে ৪ বার অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং বাজার সংলগ্ন নারান্দিয়া ও বেজড়া গ্রামে অগ্নিসংযোগসহ গণহত্যা চালানো হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাদের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সহায়তা থাকা সত্ত্বেও জনসমর্থনের অভাবে তারা পরাজিত হয়। শত-শত মানুষের জীবন, মা-বোনের সম্ভ্রম ও সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে মহম্মদপুর শত্রুমুক্ত হয়। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসে মহম্মদপুর থানার মুক্তিকামী জনতার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. ১৯২৪ সালে মহম্মদপুর থানার কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭১ সালে এটি মাগুরা মহাকুমার গুরুত্বপূর্ণ থানা হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৮৩ সালে মহম্মদপুর অন্যান্য থানার মতো উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

২. James Westland, *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History and Its Commerce* (Calcutla: Bengal Secretariat Press, 1871), 9-12; সালাহ উদ্দীন আহমেদ মিল্টন, *মহম্মদপুর উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: গতিধারা, ২০১২), ১৯।

৩. Westland, *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History and Its Commerce*, 73-74; মাহবুব তালুকদার (সম্পা.) *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর যশোর* (ঢাকা: সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮), ৫৬৭।

৪. Westland. *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History and Its Commerce*, 36 - 37; O' Malley, *Bengal District Gazetteer* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1912), 36.

৫. তালুকদার (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার: বৃহত্তর যশোর*, ৫৬৭।

৬. আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তির সংগ্রামে বাংলা* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭), ২১১।

৭. খোন্দকার রওদাক আলী, পিতা- খোন্দকার ছৈয়দ আলী, গ্রাম-ঝগড়দিয়া, বয়স ৭৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ, প্রাক্তন হাইস্কুল শিক্ষক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সৈয়দ হাদিউজ্জামান, (মিরপুর-১৪, ঢাকা, নিজ বাসভবন, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৮) উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধকার মহম্মদপুর উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, যুদ্ধ, স্থানীয় বাহিনী, গণহত্যা ও বধ্যভূমি

এর ওপর মাঠপর্যায়ে গবেষণা করেছেন। তিনি সরেজমিনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করেছেন; যা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ২০২০ সালে *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ* এ প্রকাশিত হয়েছে।

৮. আসাদ, *মুক্তির সংগ্রামে বাংলা*, ২১১; মোঃ আব্দুল হাই মণ্ডল, পিতা-আব্দুল হক মণ্ডল, বয়স-৬৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: বি.কম., অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার, বর্তমানে মহম্মদপুর উপজেলার বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার, সাক্ষৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান, (মহম্মদপুর সদর, নিজ বাসভবন, অক্টোবর ২১, ২০১৮) ।

৯. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার।

১০. Talukdar Moniruzzaman, *The Bangladesh Revolution And Its Afrermath* (Dhaka: The University Press Limited, 1980), 88.

১১. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; মো. ফারুকুজ্জামান, বীর প্রতীক গোলাম ইয়াকুবের বড় পুত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, গ্রাম নারান্দিয়া, বয়স-৬৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান (নহাটা বাজার, চক্রবর্তী ফার্মেসী, অক্টোবর ২৫,২০১৮) ।

১২. আলী, সাক্ষাৎকার; মো: আকরাম মোল্লা, পিতা: আখতার উদ্দিন মোল্লা, মুক্তিযোদ্ধা ও অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সদস্য। বয়স-৭০, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ৮ম শ্রেণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান, (মহম্মদপুর থানার রাজাপুর ইউনিয়নের ঝগড়দিয়া গ্রাম, নিজ বাসভবন, অক্টোবর ১৮, ২০১৮) ।

১৩. বিনোদপুর, মাগুরা মহাকুমার মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এটি আবার মহম্মদপুর থানার একটি ইউনিয়ন পরিষদ। এর পশ্চিম দিকে নবগঙ্গা নদী প্রবাহিত। মুক্তিযুদ্ধকালে বিনোদপুর বাজার-ঘাট ছিল হানাদার বাহিনীর বধ্যভূমি।

১৪. নহাটা, মাগুরা মহাকুমার মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এটি একটি নৌ-বন্দর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। নহাটা আবার মহম্মদপুর থানার গুরুত্বপূর্ণ একটি ইউনিয়ন পরিষদ। এর পশ্চিম দিকে নবগঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে নড়াইল মহাকুমা। বর্তমানে এটি পাকা সড়ক দ্বারা অন্যান্য স্থানের সাথে সংযুক্ত।

১৫. আলী, সাক্ষাৎকার; মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; মো. আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০), ২৪৯।

১৬. ফারুকুজ্জামান, সাক্ষাৎকার; মুন্সী আছাদুজ্জামান, পিতা-মুন্সী গোলাম হোসেন, (অব: শিক্ষক ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক এর বড় ভাই), বয়স-৭০, গ্রাম, নহাটা, শিক্ষাগত যোগ্যতা: কামিল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান, (নহাটা বাজার, নভেম্বর ২৫, ২০১৮)।

১৭. ফারুকুজ্জামান, সাক্ষাৎকার, মো: ইশারাত খান, পিতা: মমিন উদ্দিন খান, মুক্তিযোদ্ধা ও অবসর প্রাপ্ত চাকুরীজীবি। বয়স-৬৮বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি, (মহম্মদপুর থানার রাজাপুর ইউনিয়নের ঝগড়দিয়া গ্রাম, নিজ বাসভবন, নভেম্বর ১২, ২০১৮) ।

১৮. জয়রামপুর, মহম্মদপুর থানার নহাটা ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম। এটি থানা সদর থেকে ১৫/১৬ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর পশ্চিম দিকে নবগঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে নড়াইল মহাকুমা। জয়রামপুরের মধ্য দিয়ে নহাটা থেকে নড়াইল পর্যন্ত একটি পাকা সড়ক রয়েছে।

১৯. ফারুকুজ্জামান, সাক্ষাৎকার; আছাদুজ্জামান, সাক্ষাৎকার; মোল্লা, সাক্ষাৎকার।

২০. ফারুকুজ্জামান, সাক্ষাৎকার; কাজী বায়েজীদ হোসেন (জামাই বাহিনীর প্রধান কাজী নূর মোস্তফা এর বড় পুত্র) বয়স-৬৫, পেশা: ব্যবসা, (মজমপুর, কুষ্টিয়া, অক্টোবর ১৮, ২০২১); হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, একাদশ খণ্ড, (ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২-১৯৮৮), ৩১৫।

২১. আছাদুজ্জামান, সাক্ষাৎকার।

২২. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; আকবর হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী* (ঢাকা: বিক্রমপুর অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৬),৭২-৭৬; আসাদ, *মুক্তির সংগ্রামে বাংলা*,২১১।

২৩. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; পরেশকান্তি সাহা, *মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১৭),৩৩৭।

২৪. ফারুকুজ্জামান, সাক্ষাৎকার; মোল্লা, সাক্ষাৎকার।

২৫. ফারুকুজ্জামান, সাক্ষাৎকার; ইশারাত খান, সাক্ষাৎকার।

২৬. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; *দৈনিক গ্রামের কাগজ;* বিজয় দিবস সংখ্যা, ২০০৪।

২৭. আলী, সাক্ষাৎকার; মণ্ডল, সাক্ষাৎকার।

২৮. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার।

২৯. ফারুকুজ্জামান, সাক্ষাৎকার; আবুল কালাম, গ্রাম, নারান্দিয়া, বয়স-৬০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, এসএসসি, পেশা: ব্যবসা, নারান্দিয়া বেজড়া গণহত্যায় শহীদ মো. মাহবুবুর রহমান মোল্যা এর বড় পুত্র, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী- সৈয়দ হাদিউজ্জামান, (নহাটা বাজার, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৯)। নারান্দিয়া বেজড়া গণহত্যায় শহীদদের নাম: মো. মাহবুবুর রহমান মোল্যা, পিতা-মৌলবী তোফাজ্জেল হোসেন মোল্যা, নারান্দিয়া; আমিন উদ্দিন মোল্যা, পিতা-কালাই মোল্যা, নারান্দিয়া, আব্দুল মালেক মোল্যা, পিতা-আবু মোল্যা, নারান্দিয়া, আব্দুর রউফ মোল্যা, পিতা-ওয়াজেদ মোল্যা, বেজড়া, আব্দুল মাজেদ, পিতা-গোলাম হোসেন, বেজড়া।

৩০. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; আলী, সাক্ষাৎকার।

৩১. এম.এ. হাসান *পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১২),৬৯।

৩২. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; সাহা, *মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা*, ৩৮৮- ৩৮৯। বিনোদপুর গণহত্যায় শহীদদের নাম: আব্দুর রাজ্জাক, পিতা-আরজান আলী, বিনোদপুর; নগেন্দ্রনাথ সাহা ও পঞ্চানন কুমার সাহা, পিতা-ক্ষুদিরাম সাহা, বিনোদপুর; প্রদ্যুৎকুমার সাহা, পিতা-ননীপদ সাহা, বিনোদপুর; দুর্গাপদ মজুমদার, পিতা-কৃষ্ণ দুলাল মজুমদার, বিনোদপুর; বিষ্ণুপদ রায়, পিতা-বলরাম রায়, বিনোদপুর; ননী গোপাল রায়, পিতা-পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, ভাবনপাড়া, মহম্মদপুর; জ্যোতিষ চন্দ্র সাহা, পিতা-যোগেন্দ্রনাথ সাহা, ভাবনপাড়া, মহম্মদপুর; শ্যামাপদ সাহা, পিতা অক্ষয় কুমার

সাহা, ভাবনপাড়া, মহম্মদপুর; চণ্ডীচরণ সরকার, পিতা-কণ্ঠি সরকার, চাউলিয়া, মাগুরাসদর; সুনীল কুমার সরকার, পিতা-আকুল সরকার, চাউলিয়া, মাগুরা সদর।

৩৩. হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী*,৭২-৭৬; জাহিদ রহমান (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধে আকবর বাহিনী: শত যোদ্ধার স্মৃতি কথা* (ঢাকা, তরফদার প্রকাশনী, ২০১৩) অধিনায়কের কথা ।

৩৪. ফারুকুজ্জামান, সাক্ষাৎকার।

৩৫. মোল্লা, সাক্ষাৎকার; খান, সাক্ষাৎকার।

৩৬. সাহা, *মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা*, ২২৩, *দৈনিক গ্রামের কাগজ*, বিজয় দিবস সংখ্যা, ২০০৪।

৩৭. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে আমি ও আমার বাহিনী*,৭২-৭৬।

৩৮. বহলবাড়িয়া, মহম্মদপুর থানার বাবুখালী ইউনিয়নের একটি গ্রাম। বাবুখালী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে, মহম্মদপুর থেকে প্রায় ২০-২২ কিলোমিটার, এবং বিনোদপুর বাজার থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। চর এলাকা।

৩৯. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থশালা:* মাগুরা (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪), ৫৩।

৪০. মণ্ডল, সাক্ষাৎকার; আলী, সাক্ষাৎকার।